‘হলদে গোলাপ’ উপন্যাস কিংবা ‘অপরতা’র সংবেদী নির্মাণ কিংবা যৌনতার বিজ্ঞান

শান্তনু সরকার

যৌনতার সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্কে নিয়ে ফুকো সহ নানা সমাজতাত্ত্বিকের কাজের সাথেই আমরা পরিচিত, সংস্কৃতির নানা দিকের মতো যৌনতারও আধিপত্যকামী ভাষ্য রচিত হয়েছে ক্ষমতার হাত ধরে, ক্ষমতা যে আধারের মধ্যে দিয়েই ক্রিয়াশীল থাকুক, তা প্রভাবিত করতে চেয়েছে সমাজে ব্যক্তিমানুষের যৌনতার ধারণা ও অনুশীলনকে, রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন ক্ষমতাশালী সমাজ-সংগঠন নানান ভাবে নানান সময়ে যৌনতার একটি আধিপত্যকামী বয়ান নির্মাণ করতে চেয়েছে, মানব সংস্কৃতির নানা দিক সম্পর্কে রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার একমাত্রিক বয়ান কম বেশি সাফল্যের সঙ্গে নির্মিত এবং প্রযুক্ত হলেও (যদিও রাষ্ট্র নামক এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যেও আছে অভ্যন্তরীণ নানা দ্বন্দ্ব), সমাজে নানা মাত্রায় এগুলি সম্পর্কে ভিন্ন বয়ান টিকে থেকেছে, এই বিভিন্নতাকে, এই ভিন্ন বয়ানের অস্তিত্বকে মুছে দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টাও জারি থেকেছে ক্ষমতাশালীর দিক থেকে, এই মুছে দেওয়ার প্রচেষ্টায় একদিকে ব্যবহৃত হয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে বলপ্রয়োগ অন্যদিকে ব্যবহার হয়েছে মতাদর্শ নির্মাণ, এই দুই এর মধ্যে দিয়ে চেষ্টা চলেছে রাষ্ট্রীয় একমাত্রিক বয়ানটিকেই জনমানসে প্রোথিত করে দেওয়ার।

জনমানসে মতাদর্শ প্রোথিত করতে গেলে প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে থাকা বলপ্রয়োগ এবং মতাদর্শগত হাতিয়ার উভয়েরই ব্যবহার, বিচার ব্যবস্থা, সশস্ত্র বাহিনী ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যেমন একভাবে রাষ্ট্রীয় বয়ানের প্রয়োগ ঘটে, তেমনই শিক্ষা ব্যবস্থা, সংস্কৃতি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে সেই বয়ানকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলে[১], রাষ্ট্রীয় বয়ানকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার প্রয়োজনে মতাদর্শ নির্মাণের অন্যতম দিক হলো যাপনের ‘স্বাভাবিকত্ব’ নির্মাণ, অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট ধরনের জীবন-যাপনকেই ‘স্বাভাবিক’ বলে মনে করা আর সেই ‘নির্দিষ্ট’তার বাইরে ‘ভিন্ন’ ভাবে বাঁচতে চাওয়াকে ‘অস্বাভাবিক’ বলে দেগে দেওয়া বা সেই যাপনকে সমাজে ‘অপর’ করে রাখা। কী খাবো, কোনটার পরে কোনটা খাওয়া হবে, কী পড়বো, কোথায় কার সাথে কীভাবে কথা বলবো, সব কিছুরই ‘স্বাভাবিক’ নিয়ম তৈরি করা হয়। কী খাবো, করবো, পড়বো, বলবো সম্পর্কে যেমন সামাজিক নিয়ম চালু থাকে, তেমনই তার সঙ্গে একই সাথে জুড়ে থাকে কী খাবো-না, করবো-না, বলবো-না প্রভৃতি। এই ‘না’ গুলি যে যে পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে সামাজিক মান্যতা পায়, তার একটি হলো ‘ট্যাবু’র নির্মাণ।

এই যাপনের কোনো কোনো দিক যেমন ব্যক্তিগত হয়েও সামূহিক উদযাপনের অংশ হয়ে ওঠে, তেমনই আবার কোনো কোনো দিক থাকে নিরুচ্চারিত। যাপনের কোন অংশ উদযাপিত হবে আর কোন অংশ গোপনে অনুশীলিত হবে, সেই বিষয়টিও ক্ষমতা কাঠামোর দ্বারাই নির্ধারিত হয়। যাপনের নানা দিককে এই যে নীরব করে দেওয়া, তার মধ্যে কখনো থাকে এক

ধরনের আগ্রাসী ক্ষমতার প্রকাশও। কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই নিরুচ্চারিত, ‘অপর’ যাপনের সঙ্গে সচেতনভাবে ক্ষমতাশালীর পক্ষ থেকে ‘অস্বাভাবিকতা’ বা ‘অপরাধ’-মনস্কতা যুক্ত করা হয়। যাপনের এই ভিন্নতাকে নীরবতায়/অপরতায় পাঠিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে একই সঙ্গে ক্ষমতার একাধিক স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। সমাজের যে অংশের যাপনকে নীরবতায়/অপরতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাঁদেরকে বাকি সমাজের এক বৃহত্তর অংশ অস্বাভাবিক বা অপরাধপ্রবণ বলে মনে করে, শুধু তাই নয়, যারা এই জীবন যাপন করে তারাও কখনো নিজেদের যাপনকে ‘অস্বাভাবিক’ বলে মনে করতে শুরু করে।

এই একমাত্রিক বয়ান নির্মাণের একটি বিশেষ দিক যৌনতা সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ নির্মাণ। যাপনের অংশ হিসেবেই যৌনতা সম্পর্কিত মতাদর্শ নির্মাণেও রাষ্ট্র ‘স্বাভাবিক যৌনতা’র ধারণা নির্মাণ করে। এই ‘স্বাভাবিক যৌনতা’র ধারণা, সময় বিশেষে আবার কিছু পরিবর্তিতও হতে পারে। অর্থাৎ রাষ্ট্র বা ক্ষমতা সব সময়ই অন্যান্য অনেক কিছুর মতো যৌনতা সম্পর্কেও জনসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করতে চায়, নির্মাণ করে চলে। সমকাম-বিসমকাম জনিত দৃষ্টিভঙ্গি বা যৌন-যাপন থেকে শুরু করে শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যক্রমে যৌনতার ধারণা কীভাবে এবং কী পরিমাণে থাকবে, এগুলিও রাষ্ট্র একভাবে নির্দিষ্ট করে। যৌনতা এবং ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্কের এই প্রেক্ষিত থেকে পাঠ করলে ‘হলদে গোলাপ’ উপন্যাসে আমরা দেখি ‘বিজ্ঞান’ অবলম্বনে রাষ্ট্র নির্মিত যৌনতার একমাত্রিক বয়ানের এক বিকল্প ও ‘অপর’ যাপনের এক সংবেদী নির্মাণ হাজির হতে।

ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতীয় সমাজে যৌনতার যে নতুন বয়ান রচিত হচ্ছিলো, তা নিয়ে একাধিক গবেষণা আছে। ভারতীয় সমাজ যেহেতু ব্যাপকভাবেই অসমসত্ত্ব, সে কারণে বর্তমানে ভারতবর্ষ বলতে যা বুঝি তার নানা অংশে ভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক যাপনের কারণেই যৌনতার ভিন্ন ভাবনা প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইংরেজদের হাত ধরে যৌনতা সম্পর্কে যে ভিক্টোরীয় নীতিবাগিশতা নির্মিত হচ্ছিল, তৎকালীন বাংলাদেশ তার অন্যতম। সেই সূত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে বাংলা সাহিত্যে যৌনতার একটি মুখ্য ধারার ভাষ্য তৈরি হয়েছে। যদিও এই ভাষ্য বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে, কখনো তা বটতলার প্রকাশনার হাত ধরে ‘পপুলার’ সাহিত্যের মাধ্যমে, কখনো বিভিন্ন ব্যক্তি লেখকের লেখনীতে, আবার কখনো ‘হাংরি’ আন্দোলনের মতো সামূহিক প্রচেষ্টায়। এই ধারাবাহিকতাতেই, সমাজে টিকে থাকা যৌনতার আধিপত্যকামী বয়ানের পাশে একটি ভিন্ন বয়ান হিসেবে ‘হলদে গোলাপ’ উপন্যাসকে আমরা পাঠ করতে পারি। আরেকটু স্পষ্ট করে বলা যায়, সমাজে টিকে থাকা যৌনতা সম্পর্কিত নানা বয়ানের মধ্যে তিনি আরেকটি ভাষ্য হাজির করছেন, যেটিকে যৌনতার বিজ্ঞানসম্মত ‘সত্য’ নির্মাণ হিসেবে দেখা যায়।

উপন্যাসে আখ্যানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিষয় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে বর্তমান সমাজে টিকে থাকা যৌনতা সম্পর্কিত নানা ট্যাবু। কখনো তা কৈশোরকালীন যৌন সমস্যা, কখনো সমলিঙ্গের প্রেম, আবার কখনো তা রূপান্তরকামিতা। এই প্রতিটি বিষয়ই আমাদের সামাজিক এবং ব্যক্তিক যাপনের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে যুক্ত, তবুও সামাজিক নীরবতার কারণে এগুলি

সম্পর্কে সমাজে চূড়ান্ত অজ্ঞানতা বা ভুল ধারণা দেখা যায়। উপন্যাস যেহেতু একভাবে ঔপন্যাসিকের মতাদর্শ হাজির করার এক হাতিয়ারও, ফলে এই উপন্যাসে স্বপ্নময় সচেতনভাবেই বিষয় হিসেবে বেছে নেন সামাজিক ট্যাবু জনিত কারণে ব্যাপক মানুষের অজ্ঞতার এই বিশেষ দিকটিকে। লেখক প্রশ্ন করতে চান এই ট্যাবুগুলি বহন করার যৌক্তিকতাকে। তিনি ভাঙ্গতে চান এই ট্যাবুগুলিকে—বৈজ্ঞানিক ভাবনার শরিক করতে চান তাঁর আপামর পাঠককে।

এখানে 'ট্যাবু' নিয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন, ফ্রয়েড তাঁর 'Totem and Taboo" গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে— TABOO AND THE AMBIVALENCE OF EMOTIONS'এ ট্যাবুর অর্থ নিয়ে আলোচনা শুরু করছেন, 'For us the meaning of taboo branches off into two opposite directions, On the one hand it means to us sacred, consecrated : but on the other hand it means uncanny, dangerous, forbidden and unclean. The opposite for taboo is designated in Polynesian by the word *noa* and signifies something ordinary and generally accessible.'[২] অর্থাৎ ট্যাবুর সাথে একভাবে জুড়ে আছে নিষিদ্ধতা, অশুদ্ধতা, বিপদের সম্ভাবনার বিশেষ এক ধরনের বোধ। আদতে যেহেতু এটি (ট্যাবু) একটি পলিনেশিয় শব্দ ফলে সেই সংস্কৃতিতে এর বিপরীত একটি শব্দও বহাল আছে 'নোআ', যার অর্থ 'সাধারণ' বা সর্ব ব্যবহার (আলোচনা)-যোগ্য। ফ্রয়েড তাঁর এই লেখাতে যাঁর লেখাটিকে একাধিকবার ব্যবহার করেছেন তিনি হলেন একজন ইংরেজ Anthropologist, Northcote Whitridge Thomas. Encyclopedia Britannica-তে 'Taboo' নিয়ে তাঁর যে লেখা, সেটিকে একাধিকবার উদ্ধৃত করছেন ফ্রয়েড, সেখান থেকে ফ্রয়েড তাঁর লেখাতে 'ট্যাবু'র শ্রেণিভেদটিও উদ্ধৃত করছেন— "Various classes of taboo in the wider sense may be distinguished : 1. natural or direct, the result of 'mana' mysterious (power) inherent in a person or thing; 2. Communicated or indirect, equally the result of 'mana' but (a) acquired or (b) imposed by a priest, chief or other person; 3. intermediate, where both factors are present"[৩]. (নজরটান প্রাবন্ধিকের) এই অংশটি উদ্ধৃত করার কারণ হল এই শ্রেণিবিভাগের দ্বিতীয় ভাগটির প্রতি নজর দেওয়া। অর্থাৎ সামাজিক ট্যাবু সৃষ্টির পেছনে যে সামাজিক ক্ষমতাসীনের একধরনের ভূমিকা থাকে যা ফ্রয়েডের আগেই সমাজ গবেষকদের নজরে পড়েছিলো তা দেখানো। ফ্রয়েড তার বই-এর এই অধ্যায়ে এরপর যে আলোচনা করেন সেখানে তাঁর অন্যতম বক্তব্য হল এই যে, আদিম সমাজে আদিমতম ট্যাবুজনিত যে নিষেধ প্রযুক্ত হয়েছিল 'টোটেমিসম'-এর দুটি প্রাথমিক নিয়মাবলীকে কেন্দ্র করে, তার একটি ক্ষেত্র হল টোটেমভুক্ত সহযোগীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধ। এই যে নিষেধাত্মক নির্দেশাবলী, তা তাঁর মতে প্রাথমিকভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল গোষ্ঠীপতি অথবা 'গোষ্ঠীপুরোহিত' জাতীয় কোনো ক্ষমতাশালীর মাধ্যমে, পরবর্তী কালে যা হয়তো ধীরে ধীরে মানবমনের নির্জ্ঞানের অংশ হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে, ট্যাবু নির্মাণের পেছনে ক্ষমতার এক ধরনের প্রয়োগ আছে, আর এই ট্যাবুগুলি সমাজে টিকে থাকলে সামাজিক ক্ষমতা বিন্যাসের যে জাড্য তা নিশ্চল থাকে। ক্ষমতার বিন্যাস যেভাবে বদলেছে, সেভাবে পুরোনো ট্যাবু ভেঙ্গে আবার নতুন ট্যাবুর জন্মও হয়েছে।

দীপায়ন পর্বের আগে পর্যন্ত 'সত্য' নির্মাণে মূল ভূমিকা নিয়েছিলো মিথ, বিশ্বাস ইত্যাদি। এই মিথ বা বিশ্বাস আবার যে উপাদানগুলি নির্ভর করে গড়ে উঠেছিলো তার মধ্যে ট্যাবু'র মতো উপাদানও ছিল। দীপায়ন পর্বের পরে এই 'সত্য' নির্মাণে প্রধান ভূমিকাটি নেয় 'বিজ্ঞান'। বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পদ্ধতি-প্রকরণের মধ্যে দিয়ে পুরোনো বহু 'সত্য' ভেঙ্গে নতুন 'সত্য' নির্মিত হয়। পুরোনো মিথ, বিশ্বাস যেমন ভেঙ্গে পড়ে, তেমনই এগুলি যে নানা উপাদানের মধ্যে দিয়ে রূপ পেয়েছিল, সেগুলিও আর পুরোনো রূপে থাকতে পারেনা। বিজ্ঞানের মাধ্যমে 'সত্য' নির্মাণের নানা পদ্ধতির অন্যতম প্রকরণ হল 'নিরীক্ষা'। যে কোনো বিষয় সম্পর্কে সত্যে উপনীত হতে গেলে সেই বিষয়টিকে নিরীক্ষাধীন হতে হয়। আর নিরীক্ষাধীন হতে গেলে সেই বিষয়কে ব্যাপক চর্চার বিষয় হিসেবে গড়ে তুলতে হয়। যৌনতা সম্পর্কিত ট্যাবুর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

কোনো বিষয়কে চর্চায় না এনে নীরবতায় পাঠিয়ে দেওয়ার মধ্যে ক্ষমতার এক ধরনের অনুশীলন চলে। জনমানসে সেই বিষয়টি সম্পর্কে নানা ভুল ধারণা তৈরি হয় বা ভুল ধারণা তৈরি করে টিকিয়ে রাখা হয়। একে আমরা 'নীরবতার রাজনীতি' বলতে পারি। এই উপন্যাসে সেই ধরনের বিষয়গুলোকেই সামনে নিয়ে আসা হয়েছে যেগুলি সম্পর্কে সচেতনভাবে সমাজে ভুল ধারণা টিকিয়ে রাখার জন্যে সেগুলির চারপাশে এক 'না'-এর গন্ডি টেনে দেওয়া হয়েছে, ঔপন্যাসিক এই 'না'-এর গন্ডিটাকে প্রশ্ন করতে চেয়েছেন, ভাঙতে চেয়েছেন। আমরা যদি আখ্যান অংশের দিকে খেয়াল করি, তবে দেখবো আখ্যানের প্রোটাগনিস্ট অনিকেত রেডিওতে সেই ধরনের অনুষ্ঠানই প্রযোজনা করতে চায় যেগুলি সম্পর্কে সমাজে স্বাভাবিক ভাবে সামনাসামনি সাধারণত আলোচনা হয় না অথবা যেগুলি সম্পর্কে সমাজে ভুল ধারণা আছে। পুরো উপন্যাস জুড়েই অনিকেত হেঁটে চলে মানব ইচ্ছার সেইসব অলিগলিতে, যে অলিগলিগুলোর প্রবেশমুখে টাঙানো আছে কিছু খবরদারির চোখরাঙানো মুখমন্ডল, যে মুখগুলি নিরন্তর এই জানান দিয়ে যায় যে ইচ্ছের এই অলিগলিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অনিকেত এই মুখগুলি সরিয়ে গলিপথ উন্মুক্ত করতে চায়, প্রশস্ত করতে চায়।

এই উপন্যাসে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে তার প্রথমটি হল 'কিশোর-কিশোরীদের নিজস্ব সমস্যা'[৪]। সেই সূত্রে রেডিওতে একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে 'অনিকেত'কে নানা প্রশাসনিক সমস্যার মুখোমুখিও হতে হয়, উপন্যাসে 'কেন্দ্র-অধিকর্তা'র যে উক্তি, 'এরকম অশ্লীল প্রোগ্রাম রেডিওতে করার কথা কীভাবে ভাবছেন'[৫], তা কিন্তু শুধুমাত্র কোনো ব্যক্তি অধিকর্তার নিজস্ব ভাবনা নয়। এটি আসলে যৌনতা সম্পর্কিত রাষ্ট্রিক একটি বয়ান। এই বিষয়টি আদপেই কল্পিত নয়। সংস্কৃতিতে বা নির্দিষ্টভাবে যৌনতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বয়ান নির্মাণের একটি তথ্য আমাদের দেশের থেকে দেওয়া যেতে পারে। ১৯৫২ সালে রেডিওতে হিন্দি সিনেমার গানের সম্প্রচারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বি. ভি. কেশকর। তাঁর মতে হিন্দি সিনেমার গান 'ভালগার'। যদিও ব্যাপক জনমতের চাপে ছয় মাসের মধ্যেই এই নির্দেশ প্রত্যাহৃত হয়ে রেডিওতে হিন্দি সিনেমার গানের সম্প্রচার আবার চালু হয়ে ছিল।[৬]

আখ্যান অংশে আমরা দেখি রেডিওতে ‘সন্ধিক্ষণ’ অনুষ্ঠানটি বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে এবং অনেকে নিজেদের যৌনতা সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন চিঠির মাধ্যমে লিখে পাঠাচ্ছেন। প্রশ্নগুলো থেকে বাছাই করে উত্তর দেওয়া হচ্ছে অনুষ্ঠানটিতে। উত্তর কারা দেবেন? তার জন্য আছে ‘রিসোর্স পার্সনস’। অর্থাৎ একজন করে মনোবিদ, ডাক্তার, গায়েনাকোলজিস্ট, সমাজতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিক। তাঁরা কী করবেন? তাঁরা সমাজে ব্যাপক মানুষের মধ্যে টিকে থাকা যৌনতা সম্পর্কে ‘ভুল’ ধারণাকে ‘ঠিক’ করতে সাহায্য করবেন। এই ধারণা বদল করতে তাঁদের হাতিয়ার হল বিজ্ঞান অর্থাৎ ট্যাবু, মিথ এবং বিশ্বাসের মিলমিশে যৌনতা সম্পর্কে জনমানসে যে ‘সত্য’ উৎপাদিত হয়েছিল, এতদিন ধরে টিকেছিল, যে সত্য এই ধারণা তৈরি করেছিলো যে, ‘৮০ ফোঁটা রক্ত থেকে এক ফোঁটা সিমেন তৈরি হয়, ওসব বেরিয়ে যাওয়া মানে শরীরের সার পদার্থ চলে যাওয়া’[৭], সেই ‘সত্য’ মুছে ফেলে বিজ্ঞাননির্ভর ‘সত্য’ উৎপাদিত হবে। জনপ্রিয়তার স্তরে এই নতুন ‘সত্য’ উৎপাদনের জন্যেই ‘অনিকেত’-এর এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। সেখানে হাজির একদল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ, যাদের কেউ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ‘মন’-এর ‘সত্য’ জানেন, কেউ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ‘শরীর’-এর ‘সত্য’ জানেন, কেউ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ‘নারী শরীর’-এর ‘সত্য’ জানেন, কেউ আবার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ‘সমাজ’-এর ‘সত্য’ জানেন।

রাষ্ট্রযন্ত্রের অভ্যন্তরীণ পরিসরে যৌনতা বিষয়ক রাষ্ট্রীয় বয়ান নির্মাণে যে টানাপোড়েন চলে তাও একভাবে উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। ঐ অনুষ্ঠানটিকে নিয়ে আকাশবাণীর কেন্দ্র অধিকর্তার যে দোদুল্যমানতা তা তারই প্রকাশ। এছাড়াও সমলিঙ্গের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বা যৌন সম্পর্ককে কীভাবে দেখা হবে তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যেও এ বিষয়টি স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গেই বিজ্ঞানসম্মত ‘সত্য’ নির্মাণের তাগিদে ঔপন্যাসিক বিভিন্ন বাস্তব-ঘটনা বা বাস্তব-চরিত্রকে এনে হাজির করেন এই উপন্যাসে। সে কারণেই ‘অনুষ্টুপ’, ‘অমিতরঞ্জন বসু’ বা ‘মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়’-এর মতো চেনা নামগুলি উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়।

এভাবে সারা উপন্যাস জুড়ে কৈশোরকালীন যৌনতা থেকে শুরু করে সমলিঙ্গের যৌন সম্পর্ক, শারীরিক রূপান্তরকামিতা, হিজড়া জীবন প্রভৃতি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত ‘সত্য’ নির্মিত হয় এ উপন্যাসে। কখনো এ বিজ্ঞান সরল জনবোধ্যতার রূপ নিয়ে পরিবেশিত হয় রেডিওতে। কখনো আবার সিরিয়াস প্রবন্ধের আদলে রূপান্তরকামিতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ‘সত্য’ নির্মাণে শুধুমাত্র মানব কোষের ক্রোমোজোমের ‘ক্যারিওটিক টাইপ’ই নয়, আলোচিত হয়, ‘আইডেন্টিক্যাল টুইনস’, ‘টার্নার সিনড্রম’, ‘ক্লাইনেফেল্টার সিনড্রম’ ‘মুলেরিয়ান ডাক্ট’, ‘উলফিয়ান ডাক্ট’, ‘ইউনিকয়েড গ্রোথ’ প্রভৃতি নিয়েও। উপন্যাস পাঠের মধ্যে দিয়ে পাঠক-পাঠিকা জেনে যায় ‘টার্নার সিনড্রম’ অর্থ ক্রোমোজোমের সংখ্যা ৪৫X, আর ‘ক্লাইনেফেল্টার সিনড্রম’-এর অর্থ ক্রোমোজোমের সংখ্যা ৪৭XY অথবা ৪৮XXXY।

বৈজ্ঞানিক সত্য নির্মাণেই সারা উপন্যাস জুড়ে ঔপন্যাসিক একের পর এক ট্যাবু ভাঙতে ভাঙতে যান, নিরুচ্চারিত, গোপন, নিষেধাত্মক যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে বিজ্ঞানের ‘আলো’য়, ‘আলোকিত’ করার চেষ্টা করেন। এই বৈজ্ঞানিক ‘সত্য’ নির্মাণের প্রচেষ্টাতেই উপন্যাসে উঠে আসে হিজড়া জীবন। ‘যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা’,

এই জেনে সেই জীবনকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ‘যথাযথ’তায় ‘মানুষের’ সামনে হাজির করতে চান ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসের একটি চরিত্র, যার নাম ‘দুলাল’, সে একটি বয়সের পরে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, পরে বোঝা যায় যে সে হিজড়াদের দলের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজে হিজড়াতে রূপান্তরিত হয়েছিল। দুলালের হিজড়া-সংস্পর্শ এবং হিজড়া হয়ে যাওয়ার আখ্যান নির্মাণ করে এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র ‘অনিকেত’।

হিজড়া বলতে আমরা বুঝি ‘রূপান্তরিত’ বা ‘রূপান্তরকামী’ একদল মানুষ, যারা শারীরিকভাবে নানান মাত্রায় পুরুষ যৌনতার চিহ্ন বহন করে অথচ, মানসিক ভাবে নারী, যারা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করে এবং মূলত ভিক্ষাবৃত্তি, নবজাতককে আশীর্বাদ বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ বা যৌন সম্পর্কের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশেই মূলত তাঁদের এই রূপ-এ দেখা যায়। এই অঞ্চলগুলিতে তারা সমাজের ‘মূলধারা’য় প্রবেশাধিকার না পেলেও পৃথিবীর অন্যত্র এই ধরনের ‘রূপান্তরকামি’রা সমাজের ‘মূলস্রোতে’ই মিশে থাকে। যেহেতু আমাদের উপমহাদেশে এরা সমাজের মূলস্রোতের অংশ নয়, ফলে হিজড়া-বহির্ভূত সমাজে হিজড়া-জীবন বেশ অপরিচিত। হিজড়া-বহির্ভূত সমাজে হিজড়াদের সম্পর্কে আছে এক ধরনের ‘নিষিদ্ধ’ কৌতূহল, প্রচুর ভুল ধারণা এবং চূড়ান্ত অবজ্ঞা। আলোচ্য উপন্যাসে এক দীর্ঘ পরিসর জুড়ে আছে এই হিজড়া সমাজের উপস্থাপন।

এই আখ্যান নির্মাণের সূত্রেই পশ্চিমবঙ্গের হিজড়া জীবনকে, যে জীবন ব্যাপক মানুষের কাছে খুব পরিচিত নয় সেই জীবনকে বিস্তৃতভাবে হাজির করেন ঔপন্যাসিক। হিজড়া যাপন, যা ব্যাপক মানুষের কাছে কৌতূহল-উদ্দীপক নিষিদ্ধ এক যাপন, সেই যাপনকে বিজ্ঞানের ‘আলো’য় এনে নতুনভাবে পরিচিতি ঘটানোর চেষ্টা করেন ঔপন্যাসিক। বৈজ্ঞানিক ‘সত্য’ নির্মাণের প্রয়োজনে একদিকে তিনি হিজড়া জীবনের বাস্তবতা, হিজড়াদের আরাধ্য দেবী হিসেবে ‘বহুচেরা’ মা সম্পর্কিত তথ্য, গুজরাতে সেই দেবী মন্দির, পশ্চিমবঙ্গে হিজড়াদের ‘ধর্ম-উৎসব’, লিঙ্গচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে হিজড়া হয়ে ওঠার বর্ণনা ইত্যাদি যথাযথভাবেই উপন্যাসে হাজির করেন। অন্যদিকে তিনি তাঁর আখ্যানে হিজড়াদের নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে এমন এক ‘বুলি’ বা ভাষার ব্যবহার করেন যা হিজড়া ছাড়া অন্যান্যদের কাছে অবোধ্য।

এই বিষয়টি একটু দীর্ঘ আলোচনা করা যাক। কারণ এই বিশেষ ভাষা বা বুলির ব্যবহার তিনি করেন বৈজ্ঞানিক-সত্য নির্মাণেই। এই আলোচনা করতে গিয়েও আমাদের বিজ্ঞানের সাহায্যই নিতে হবে। আমরা শৈলীবিজ্ঞান এবং ভাষাবিজ্ঞানের দু-একটা সূত্রের প্রয়োগ করে এই ‘বৈজ্ঞানিক-সত্য’ নির্মাণের পথটি বোঝার চেষ্টা করতে পারি। আমরা জানি, শৈলীবিজ্ঞান হল ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা যা সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার ‘বৈজ্ঞানিক’ বিশ্লেষণের (বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ) মাধ্যমে সাহিত্যের বিশেষ সংরূপটির সাধারণ সূত্র নির্ণয় করতে চায়। অর্থাৎ শৈলীবিজ্ঞানকে আমরা সাহিত্য ব্যাখ্যানের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে দেখতে পারি।

উপন্যাসের ভাষা-শৈলী আলোচনা করতে গিয়ে শৈলীবিজ্ঞানীরা নানা বিষয়কেই লক্ষ করেছেন। তার মধ্যে একটি হল ‘রেজিস্টার’-এর ব্যবহার। সমাজভাষাবিজ্ঞানে ‘রেজিস্টার’

বলতে বোঝায়, প্রতিবেশ অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যকে। প্রতিদিনের সামাজিক যাপনে মানুষ এমন বহু শব্দের ব্যবহার করে যে শব্দগুলি মূলত নির্দিষ্ট কিছু পেশা বা পরিস্থিতিতেই ব্যবহার হয়। নির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত বা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বা কথোপকথনরত ব্যক্তিদের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের বিশেষত্বকেই 'রেজিস্টার' বলে। আমরা এই প্রসঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানী M.A.K. Haliday প্রদত্ত Register-এর ধারণাটি উল্লেখ করতে পারি, "It refers to the fact that the language we speak or write various according to the type of situation. This in itself is no more than stating the obvious."[৮] পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের ভিন্নতাকে চিহ্নিত করছেন তিনি। আর উপন্যাসে 'ভিন্ন পরিস্থিতি', 'ভিন্ন যাপন'-এর বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপনের প্রয়োজনে 'রেজিস্টার'-এর ব্যবহার করছেন ঔপন্যাসিক, হিজড়াদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 'সত্য' নির্মাণে হিজড়াদের মুখের ভাষায় এই 'রেজিস্টার'-এর ব্যবহার।

এই আখ্যান অংশে হিজড়াদের অভ্যন্তরীণ জীবন ফুটিয়ে তুলতে আমরা দেখি প্রচুর এমন শব্দ ব্যবহার হচ্ছে যেগুলি শুধুমাত্র হিজড়ারাই ব্যবহার করে এবং যে শব্দগুলির অর্থও শুধুমাত্র হিজড়ারাই জানে। হিজড়াদের বাইরের কেউ এগুলির যথাযথ অর্থ জানে না। উপন্যাসে এই ধরনের শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বেশির ভাগ জায়গায় পাঠকের জন্য শব্দগুলির অর্থও উল্লিখিত হয়েছে। 'রেজিস্টার' হিসেবে ব্যবহৃত এই ধরনের শব্দ এবং তার অর্থগুলিকে এখানে বর্ণের ক্রম অনুযায়ী উল্লেখ করা হচ্ছে, তারপরে এ নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাবে।

আ.

আটপুর—হিজড়াদের সাময়িক আস্তানা।

আকুয়া—যিনি শারীরিকভাবে পুরুষ তার হিজড়াত্ব পাওয়া।

আগুড়ি—''উঁচু'' জাত (আগ - এগিয়ে আছে যারা)।

আকখাট—প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ।

ই.

ইলু ইলু বল—একটু শক্ত জলভর্তি বেলুন, যা হিজড়ারা সাধারণত ব্লাউসের ভেতরে রাখে স্তনের নকল হিসেবে।

ইকরা-বিকরা—শিষ্য-শিষ্যা।

এ.

একমাসিয়া—পুরুষের লিঙ্গ কর্তনের মাধ্যমে 'ছিন্নি' হওয়ার একমাস পরে যে আচার অনুষ্ঠান।

ক.

কড়ি—লুকিয়ে রাখা।

কড়ি ড্রেস—মানসিকভাবে যে নারী, অথচ শারীরিকভাবে পুরুষ হওয়ার জন্যে বাধ্য হয়ে যখন পুরুষের পোশাক পরতে হয়, তখন তার পোশাককে বলা হয়।

কোতি - 'মেয়েদের হাবভাব' সম্পন্ন পুরুষ।

খ.

খাপরি—পরচুলা।

খারি—পরচুলা।

খিলুয়া—মদ।

খোবরা—মাংস।

খোমর-টোমর করা—প্রাক যৌনসঙ্গম আদর (ফোরপ্লে)।

গ.

গয়দা—নারী পুরুষের যৌন ক্রিয়া।

গয়না—ব্যক্তি, যে হিজড়া হতে চায়।

গুরু-বোন—একই গুরুমা'র শিষ্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক।

গুরুমা—হিজড়াদের একটি দলের প্রধান।

চ.

চাপ্পু—রিভলবার বা ছোট আগ্নেয়াস্ত্র।

চামনা—এই শব্দটি একাধিক অর্থবহ। মূল ভাবটি হল কোনো কিছুর ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। ব্যবহার অনুযায়ী অর্থের সামান্য পরিবর্তন হয়, যেমন 'খিলুয়া চামনাচ্ছে' মানে মদ খাচ্ছে। 'পারিক চামনাচ্ছে' মানে প্রেমিক জোগাড় করছে, 'ফুল চামনাচ্ছে' মানে ফুল পাড়ছে, এরকম।

চিপটি—যোনি।

চিপটিধারী—'চিপটি' আছে যার।

চিস্যা—পছন্দ করা।

চেলি—'গুরুমা'র হিজড়া শিষ্যা।

ছ.

ছক্কা—মজা বা আনন্দ।

ছমকানো—গা জোয়ারি করা।

ছল্লা—হিজড়াদের প্রাত্যহিক অর্থ উপার্জনে যাওয়া।

ছাপান—সমাজে হিজড়ার নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

ছিন্নি—হিজড়া হওয়ার জন্য লিঙ্গছেদ (ছিন্ন)।

ছিবড়ি—যে শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ নারী না হলেও অনেকটাই নারী, অনিয়মিত ঋতুস্রাব হয়।

ছিবড়ে নেওয়া—লিঙ্গ কর্তন করে নেওয়া।

ছেমো— 'পারিক'কে নকল রাগ অভিমান দেখানো।

ছোট খোকা—রিভলবার।
ছোট খোবরা—মুরগির মাংস।
জ.
জম্মু—দারুণ ভালো। (জম্পেশ - জম্পু - জম্মু।)
জন হিজড়ে - "'জন' হল শ্রম-দুনিয়ার একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। দিনমজুর। জন-হিজড়েরা হিজড়ে খোলের সবচেয়ে কম আদৃত মানুষ। ওরা বাড়ির কাজ করে, রান্নাবান্না, বড় পরিবারের অন্যান্য বহু কাজ, কিন্তু জন হিজড়েরা কোনও নির্দিষ্ট খোলে বেশিদিন থাকে না। না-পোষালে অন্য খোলে চলে যায়। ওরা হিজড়ে খোলই পছন্দ করে। তবে অনেক সময় কোনো হোটেল বা চায়ের দোকানেও এদের কাজ করতে দেখা যায়। ওখানে প্রচুর গঞ্জনা এবং খদ্দেরদের টিপ্পনি শুনতে হয় বলে হিজড়ে খোলে কাজ করাই পছন্দ করে। যে-খোলে কাজ করে, সেই খোলের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। জন-হিজড়েরা কথাবার্তায় একটু দুর্বল। বাঁধাই খাটতে গেলে যেসব ছল-চাতুরি করতে হয়। সেটা তারা ভালো পারে না। দেখতেও ভালো না। হিজড়ে সমাজে এরা একটু শোষিত"[৯]।
ঝ.
ঝলকি—টাকা পয়সা।
ঝামেলি—ঝামেলা।
ট.
টুনি—কন্যাসন্তান।
টোনা—পুত্রসন্তান।
ঠ.
ঠিকরি—হিজড়াদের হাতের বিশেষ তালি।
ঠিকে হিজড়ে—যে হিজড়াদের কোনো স্থায়ী 'খোল' নেই, কিছুদিনের জন্য এক 'গুরুমা'র অধীনে থাকে যে সব সাধারণ হিজড়া।
ঠিপে—দলে ভিড়ে যাওয়া।
ঠুংঠাং—প্রতাপশালী বা পয়সাওয়ালা।
ড.
ডুপ্লি—যারা নিজেদের পশ্চাদ্দেশকে ব্যবহার করে যৌন সঙ্গম করে আবার অন্যের সঙ্গেও পায়ু সঙ্গম করে।
থ.
থাপ্পু—থানার পুলিশ কে যে মাসোহারা দিতে হয়।
দ.
দর্শন—সন্না, যা দিয়ে শরীরের লোম তোলা হয়।
দাগ খাওয়া—হিজড়াত্বে দীক্ষা নেওয়াকে আদর করে বর্ণনা করা।
দিক্ষে—হিজড়া জীবনে অনুপ্রবেশ উপলক্ষে আচার আনন্দ অনুষ্ঠান।

ধ.
ধুরপিট্টি—যৌনসম্পর্ক।
ধুরানি—'কোতি'র তুলনায় একটু বেশি 'নারী স্বভাব' বিশিষ্ট পুরুষ, যে কখনো পায়ুসঙ্গম করেছে এবং কিছুটা 'রূপান্তরকামি'।
ধুরি—বোকা'র বিশ্লেষণ।
ধুরে দেওয়া—দুই পুরুষের মধ্যে পায়ুসঙ্গম।
ন.
নথ ভাঙ্গা—'কৌমার্য' ভঙ্গের হিজড়া আচার।
নববস্তর—নতুন বস্ত্র পরিধান, যা আসলে হিজড়া জীবনে অনুপ্রবেশ সূত্রে পোশাকের পরিবর্তন আচার।
নাগিন—মিষ্টি মিষ্টি দেখতে 'পুতুপুতু' পুরুষ, যে হিজড়া হতে চায়।
নির্বাণ—লিঙ্গমুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ হিজড়া হওয়া।
নিরাখ —শরীরের রক্ত বা পরিশ্রমজাত ঘাম।
নুনে নুন—একই গোষ্ঠীর / ভাবনার মানুষ।
প.
পতানো—কাটা বা ফেলে দেওয়া।
পাও পরতি—প্রণাম করা।
পারিক—এক ধরনের মানসিক সম্পর্ক সহ কিছুটা নিয়মিত যৌন সঙ্গী, প্রেমিক জাতীয়।
প্যাতপ্যাতে—ছোট, দুর্বল।
পোঁতাপুঁতি—প্রবেশ করানো। সাধারণত পুরুষ লিঙ্গের দ্বারা সঙ্গম অর্থাৎ, অন্যের শরীরে পুরুষ লিঙ্গকে প্রবেশ করানো অর্থে ব্যবহৃত হয়।
পৈতে—'ছিন্নি' হয়ে নতুন জীবনে প্রবেশ।
ফ.
ফয়রা—মোষের সিং-এ তৈরি শিঙে। 'ছিন্নি'র পরে প্রসব করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
ফোঁদল—পুরুষের লিঙ্গ ছিন্ন করার পরে যে কাটা জায়গাটা থাকে তা।
ব.
বড় খোবরা—পাঁঠার মাংস।
বাঁধাই খাটা—হিজড়াদের রোজকার ধরাবাঁধা কাজ, যার মধ্যে দিয়ে উপার্জন করা হয়।
বাট্টুবাজী—পায়ুসঙ্গম করে উপার্জন করা।
বাবা—'গুরুমা'র প্রধান 'পারিক'।
বিলা—ঝামেলা।

ভ.

ভেল—ঝামেলা।

ম.

মাংতি—প্রাপ্য বখশিস।

ল.

লগদা—নগদ।

লিকম—পুরুষ লিঙ্গ।

লিকম বসা—'ছিন্নি' হওয়ার একমাস পর থেকে পায়ুতে নানা মাপের কাঠের পুরুষ লিঙ্গ প্রবেশ করানোর অনুশীলন।

লোলা—বাচ্চাদের কাঠের খেলনা যা 'পায়ু-ব্যায়াম' এ কাজে লাগে।

শ.

শুধরানি—'ছিন্নি' হওয়ার পরেপরে যে প্রস্রাব।

হ.

হাওড়াইয়া—হিজড়াদের নানান ঘরানা বা ধারা আছে, তার মধ্যে একটি ধারা বা ঘরানা।

হামসি—আমাকে বা আমি।

হিলিহিলি—আনন্দের সঙ্গে।

উপন্যাসে হিজড়াদের মুখের এই ভাষা ব্যবহার কল্পিত নয়, বহু শতাব্দী ধরেই হিজড়ারা নিজেদের মধ্যে একধরনের 'গুপ্ত' ভাষায় কথা বলে, যা এই সমাজের বাইরের মানুষদের কাছে মূলত অপরিচিত। আসলে প্রান্তিকায়িত মানুষেরা এই সমাজে টিঁকে থাকার জন্যে নানা ধরনের কৌশল নেয়। তার মধ্যে একটি হল নিজেদের মধ্যে আরো বেশি ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলে বেঁচে থাকা, আরো বেশি করে 'হাতে হাত বেঁধে থাকা'। এই ঘনিষ্ঠতার অংশ হিসেবেই তাঁদের নিজেদের মধ্যে এই 'গুপ্ত' ভাষার ব্যবহার। এই ভাষাটি গবেষকদের কাছে 'হিজড়া-ফার্সি' নামে পরিচিত। এই ভাষার নাম 'হিজড়া-ফার্সি' হলেও এই ভাষার সঙ্গে ফার্সি ভাষার খুব মিল নেই। এ বিষয়ে একাধিক গবেষক কাজ করলেও এই 'হিজড়া-ফার্সি'র শুরু কীভাবে এবং ঠিক কবে থেকে হয়েছিল তা নিয়ে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। যদিও হিজড়াদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন এই ভাষার শুরু হয়েছিল তখন, যখন গোটা দক্ষিণ এশিয়া জুড়েই ছিল মোঘল সাম্রাজ্য। ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা 'কিরা হল' ভারতবর্ষের হিজড়াদের ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁর মতে এই ভাষাকে 'হিজড়া-ফার্সি' বলে অভিহিত করার কারণ, হিজড়ারা বিশ্বাস করে যে তাঁদের পূর্ব প্রজন্ম একসময়ে ছিল মোঘল সাম্রাজ্যের রাজদরবারের অংশ। যেহেতু মোঘল রাজদরবারের ভাষা ছিল ফার্সি, ফলে তাঁদেরও ভাষা সেখান থেকেই উদ্ভূত[১০]।

মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে ঔপনিবেশিক আইনের মাধ্যমে হিজড়াদেরকে, হিজড়া নাচকে অপরাধ-প্রবণ বলে চিহ্নিত করা হয়, হিজড়ারা হয়ে পড়ে প্রান্তিকায়িত। এই পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করার জন্য নিজেদের ভাষাকে তাঁরা সংরক্ষণ করে এবং অন্যান্যদের কাছে নিজেদের পরিচিতি গোপন করার

জন্য এই ভাষাকে কিছুটা পাল্টে নিয়ে এক ধরনের গোপন বা গোষ্ঠী ভাষায় পরিণত করে, যা কালক্রমে বর্তমান ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে M.A.K. Halliday-কে উদ্ধৃত করতে পারি, কারণ তিনি এই ধরনের গোষ্ঠী, এবং তাঁদের ভাষা নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি এই ধরনের সমাজগোষ্ঠীকে নাম দিয়েছেন "Anti Society", তাঁর মতে 'An anti society is a society that is set up within another society as a conscious alternative to it. It is a mode of resistance, resistance which may take the form either of passive symbiosis or of active hostility and even destruction.'[১১] এই ধরনের সমাজ নিজেদের মধ্যে যে ভাষা ব্যবহার করে তাকে তিনি বলেন— "Anti Language"। "'an anti-language however is nobody's "mother tongue"; it exists solely in the context of resocialization, and the reality it creates is inherently an alternative reality, one that is constructed precisely in order to function in alternation. It is the language of an anti society.'"[১২] ঔপনিবেশিক সময়পর্বে আগত বিভিন্ন ভ্রমণকারীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে Hall'ও দেখিয়েছেন যে তাদের লেখাতেও এই উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে যে ২০০ বছর আগেও হিজড়ারা নিজেদের মধ্যে এক ধরনের জটিল এবং গোপন ভাষার ব্যবহার করতেন।

উপন্যাসে হিজড়াদের মুখে ব্যবহৃত 'বুলি' যে কল্পিত নয়, বাস্তবেই হিজড়াদের মুখের ভাষা, তার প্রমাণ ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণাপত্র থেকেও পাওয়া যায়। এই যে হিজড়া-ফার্সি ভাষার ব্যবহার, তা শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলার হিজড়ারাই ব্যবহার করে না। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান প্রভৃতি দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সহ সামান্য পরিবর্তিত রূপে এর ব্যবহার হয়। পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি এবং ডি.জে.খান শহরের হিজড়াদের ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন দুজন গবেষক। তাঁরা তাঁদের গবেষণাপত্রে সেই অঞ্চলের হিজড়াদের মুখের ভাষার যে উদাহরণ দিয়েছেন তার সাথেও আমরা এই উপন্যাসে ব্যবহৃত হিজড়াদের মুখের ভাষার মিল পাই। তাঁদের গবেষণাপত্র থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।[১৩]

খোম্বর / খোমর — মুখ

চামকি—ত্বক

ছলকা—স্তন

চাপটি—হিজড়ায় রূপান্তরিত হওয়ার জন্য পুংলিঙ্গ কেটে ফেলার পরে ঐ জায়গার ছিদ্র।

লিকর—শিশ্ন ইত্যাদি।

এই উপন্যাসের শৈলী বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় একাধিক কারণে ঔপন্যাসিক 'রেজিস্টার'-এর ব্যবহার করেছেন।

প্রাথমিক কারণটি হল সামাজিক বাস্তবতা নির্মাণের প্রয়াস এবং নিষিদ্ধতার আবহে থাকা হিজড়া জীবনকে 'বিজ্ঞান সম্মত' পদ্ধতিতে জনমানসের সামনে আনা। দ্বিতীয় কারণটি একটু বিস্তৃত করার দরকার। এখানে হিজড়াদের মুখে ব্যবহৃত যে শব্দগুলি উল্লিখিত হয়েছে তার একটা বড় অংশই যৌনতার অনুষঙ্গ বহন করছে।

যৌনতার অনুষঙ্গে যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার বড় অংশকেই সাধারণত স্ল্যাং বলে উল্লেখ করা হয়। যৌনতার অনুষঙ্গ বাহিত বা স্ল্যাং শব্দ, সাহিত্যে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে

আমরা নানারকম নিষেধাত্মক যুক্তি পাই। এই নিষেধ শুধু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সত্যি এমন নয়। কী কারণে, কাদের উৎসাহে বিভিন্ন সময় এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে তা নিয়ে প্রচুর গবেষণাও হয়েছে। এই লেখায় সে প্রসঙ্গ আনার প্রয়োজন নেই। তবে শুধু সাহিত্যে ব্যবহার করাই নয় বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা বিষয়ক আলোচকরাও এই ট্যাবুর বাইরে বেরোতে পারেননি। মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান যে নির্মোহ অবস্থান দাবি করে তা অনেক ক্ষেত্রেই কম বেশি ব্যাহত হয়েছে। আসলে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রকরণের যে বদল ঘটে, সেই বিষয়টিকেও ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে ঔপন্যাসিক এখানে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। ভাষা আলোচনায় নির্দেশমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে অবস্থান বদল, যে অর্থে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিকে সূচিত করে, এই উপন্যাসে যৌন অনুষঙ্গ যুক্ত শব্দের ব্যবহারও সেই অর্থে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। বিষয়টি একটু পরিষ্কার করার প্রয়োজনে ভাষা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে এই ধরনের যে সমস্যার সম্ভাবনাগুলি আগে থেকেই ছিল, এখানে তার কিছু উল্লেখ করা যায়।

কোনো ভাষায় শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা থাকে অভিধানে। অর্থাৎ এই দিক থেকে দেখলে যে কোনো ভাষার সমস্ত শব্দাবলী পাওয়া উচিত সেই ভাষার অভিধানে। কিন্তু আমরা যদি বাংলা অভিধান রচনার ইতিহাস দেখি, তবে দেখবো উনিশ শতাব্দীর শুরু থেকে বহু বাংলা অভিধান রচিত হলেও অভিধানে মূলত স্থান পেয়েছে সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীই। কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ, যা সাহিত্যে ব্যবহার করা হয়নি সেসব শব্দকে অভিধানে স্থান দেওয়ার যোগ্য মনে করেননি সংকলকরা। এই প্রবন্ধে যেহেতু আমার আলোচ্য যৌনতার অনুষঙ্গবাহী বাংলা শব্দ, ফলে সেই ধরনের শব্দাবলীকে অভিধানের সংকলকরা কীভাবে দেখেছেন তা সামান্য আলোচনা করলে ভাষার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সমস্যাটা খানিক বোঝানো যেতে পারে।

বাংলা ভাষায় প্রাথমিকভাবে যে সব অভিধান সংকলিত হয়েছে সাধারণভাবে সেখানে 'স্ল্যাং' বলতে যে সব শব্দ বোঝায় তাদের স্থান দেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে যে সব অভিধান সংকলিত হয় তার মধ্যে প্রথমে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে সুধীরচন্দ্র সরকার রচিত ''বিবিধার্থ অভিধান''-এর নাম করতে হয়। এই অভিধানে বাংলা শব্দাবলীকে কুড়িটি শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন সংকলক, যার একটি শ্রেণির নাম ছিল, 'বাংলা অশিষ্ট বা অপশব্দ'। এই শ্রেণিতে তিনি সাতশোর বেশি স্ল্যাং-এর সংকলন করেছিলেন। এছাড়াও এ ধরনের যে 'অভিধান'গুলি প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে উল্লেখ্য, কুমারেশ ঘোষ-এর ''আড্ডার অভিধান'', সন্দীপ দত্ত সংকলিত 'স্ল্যাংগুয়েজ', সত্রাজিত গোস্বামী'র ''অকথ্য ভাষা ও শব্দকোষ''। এছাড়াও এই তালিকাতে মানসকুমার রায়চৌধুরী সংকলিত ''বাংলা অশিষ্ট শব্দের অভিধান''-এর নাম করতে হয়।

এই ধরনের অভিধানের বাইরে বাংলা ভাষায় স্ল্যাং নিয়ে আলোচনা ও শব্দকোষ হিসেবে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে। প্রথমটি ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে প্রথমে ''অপরাধ জগতের শব্দকোষ'' নামে ও পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে ''অপরাধজগতের ভাষা'' নামে প্রকাশিত হয়। গবেষকের নাম ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক। এখানে তিনি 'সমাজবিরোধী' ও 'অপরাধী'দের নানান ভাগে ভাগ করেছেন যেমন, 'পতিতা', 'চোর', 'হিজড়া', 'পকেটমার' ইত্যাদি এবং এদের

ভাষারীতিকে আলাদা করে আলোচনা ও সংকলন করেছেন। এই কারণে তিনি 'অপরাধ' জগতের ভাষাকে 'গোষ্ঠীভাষা' বা social dialect বলে উল্লেখ করেছেন।

এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় গবেষণাটি অভ্র বসু'র। তিনি ২০০৫ সালে তার গবেষণাটিকে ''বাংলা স্ল্যাং ঃ সমীক্ষা ও অভিধান'' নামে প্রকাশ করেন।

এই সংকলনগুলির মধ্যে হিজড়াদের ভাষাকে আলাদা করে সংগ্রহ করেন ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক। একদিক থেকে দেখলে তাঁর এই কাজ বাংলা ভাষা বিষয়ক আলোচনায় এক গভীর অবদান, কিন্তু আমরা দেখি সার্বিক ভাবেই হিজড়াদের তিনি 'অপরাধী' হিসেবে আখ্যা দেন এবং তাদের ভাষাকে 'অপরাধ জগত'-এর ভাষা বলেই সংকলিত করেন। তিনি যেভাবে নানান বৃত্তিকে অতিসরলীকরণ করে 'অপরাধ'-এর বৃত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে দেন তাকে আমরা এই সময়ে এসে ভাষাবিজ্ঞান, বা সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে সমর্থন করতে পারি না।

'হিজড়া' শব্দটিকে, 'অপরাধপ্রবণ' শব্দের প্রায় সমার্থক করে তোলার এই যে ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ইতিহাস, তার অন্যতম কারণ হিজড়া জীবন সম্পর্কে বহির্জগতের ধারাবাহিক অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতাকে সরিয়ে দিয়ে হিজড়াদের সম্পর্কে 'সত্য' নির্মাণের চেষ্টাতেই নির্দেশমূলক ভাষাচর্চাকারীদের দেখানো পুরোনো পথ থেকে সরে এসে, হিজড়াদের মুখের ভাষাকে সাহিত্যে তুলে আনেন ঔপন্যাসিক। চেষ্টা করেন হিজড়া যাপন সম্পর্কে সমাজে যে ট্যাবু বিরাজমান, তাকে ভেঙ্গে ফেলে হিজড়া যাপন সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত সত্য নির্মাণ করে এই 'ভিন্ন'/'অপর' যাপনকে সমাজের কাছে স্বাভাবিক যাপনের মান্যতা দেওয়ার অর্থাৎ শুধু বিষয় হিসেবেই নয়, এই উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সার্বিকভাবে ঔপন্যাসিক বিজ্ঞানভিত্তিক সত্য নির্মাণ করতে চেয়েছেন, এবং এক্ষেত্রে টিকিয়ে রাখা নিষিদ্ধতার গন্ডি ভাঙার প্রকল্পে পাঠককে অংশ নিতে আহ্বান করেছেন।

এই লেখার শুরু হয়েছিল মিশেল ফুকোর উল্লেখ দিয়ে। লেখাটি শেষও করা হবে তাঁর একটি লেখাকে পাশে রেখে। তাঁর 'HISTORY OF SEXUALITY'র প্রথম খন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেন পাশ্চাত্য যৌনতার বিজ্ঞান(সত্য) নির্মাণ পদ্ধতি নিয়ে। সেই 'Scientia Sexualis' নামক অংশে তিনি পাঁচটি পদ্ধতির কথা আলোচনা করেন। তাঁর মতে এই পদ্ধতি-প্রকরণগুলির মধ্যে দিয়েই যৌনতার বৈজ্ঞানিক সত্য নির্মিত হচ্ছিল। উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে যার ওপর ভিত্তি করে এই বিজ্ঞান হচ্ছিল, সেটি হল যৌনতা সম্পর্কিত ব্যক্তি-মানুষের নিজ অভিজ্ঞতার স্বীকারোক্তি। আলোচ্য উপন্যাসে যেভাবে যৌনতার বিজ্ঞান নির্মিত হয়েছে, সেখানেও কিন্তু যৌনতার ব্যক্তিক অনুভূতির স্বীকারোক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। খ্রিষ্টিয় পাপবোধজাত স্বীকারোক্তি আর রেডিওর অনুষ্ঠানে নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনা নিশ্চয়ই এক নয়। তবে বিজ্ঞান বা সত্য নির্মাণ পদ্ধতির মধ্যে সাযুজ্য তো আছেই। এই উপন্যাসে 'সন্ধিক্ষণ' নামক অনুষ্ঠানে আসা যে চিঠিগুলোর উল্লেখ আছে সেগুলি দেখলেই বিষয়টি পরিস্কার হবে। শুধু একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, 'প্রবর্তক' পত্রিকার একটি সংখ্যার কথা আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে যেখানে ''স্বীকারোক্তি'' নামে একটি কবিতা অনিকেত পড়ে, যার শেষটা এরকম 'মা বোঝে না, কেউ বোঝে না / কোথায় আমার আমি। / ব্যঙ্গ করে বলতে পারো / তুইতো সমকামী'।[১৪]

যে পাঁচটি পদ্ধতির কথা ফুকো বলেছেন তার তৃতীয়টি হল, "Through the principal of a latency intrinsic to sexuality"[১৫] অর্থাৎ যৌনতার সঙ্গে যে গোপনতার আবহ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল, সেই 'গোপনতার বেড়া'কে ভেঙেই এর বিজ্ঞান তৈরি হচ্ছিল। এই উপন্যাসেও আমরা দেখি যৌনতা সম্পর্কিত যে সংস্কার বা নিষিদ্ধতার বোধ, তার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটাতে চেষ্টা করেন ঔপন্যাসিক। একদিকে যেমন তিনি আখ্যানে যৌনতা সম্পর্কিত ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে রেডিও-অনুষ্ঠানের মাধমে এক ধরনের স্বীকারোক্তির আদলে পেশ করেন তেমনই সারা উপন্যাস জুড়ে বিষয়বস্তু এবং ভাষা ব্যবহার দুইয়ের মধ্যে দিয়েই যৌনতা সম্পর্কিত গোপনতার আবহকে ভাঙার চেষ্টা করেন।

ফুকো বর্ণিত চতুর্থ পদ্ধতিটি হল, "Through the method of interpretation"[১৬]। এই পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর মূল বক্তব্য হল, যার কাছে স্বীকারোক্তি করা হচ্ছে, তিনি ক্ষমা করতে পারেন বা সান্ত্বনা দিতে পারেন, এই কারণে একজন তাঁর কাছে স্বীকারোক্তি করেন না। আসলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নির্মাণের প্রয়োজনেই এই স্বীকারোক্তি করা হচ্ছে। যিনি স্বীকারোক্তি করছেন, তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাই 'সত্য', এমনটা নয়। তাঁর কাছে নিজের অভিজ্ঞতা আছে, যা বাস্তব কিন্তু অসম্পূর্ণ। যিনি এই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সাধারণীকরণ করতে পারেন সংশ্লেষিত করতে পারেন, তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া এই অভিজ্ঞতা 'সত্যে' উপনীত হতে পারে না। যাঁর কাছে স্বীকারোক্তি করা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন সত্যের নির্মাতা, সত্যের ব্যাখ্যাতা। তিনিই স্বীকারোক্তির মধ্যে লীন হয়ে থাকা চিহ্নসমূহের তাৎপর্য নিষ্কাশনের মাধ্যমে সত্যের নির্মাণ করেন। শুধু তা-ই নয় এর ভিত্তিতে করণীয় কর্তব্য সম্পর্কেও তিনি নির্দেশ দেন। উপন্যাসে 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠানটির 'রিসোর্স পার্সন'রা ফুকো বর্ণিত এই কাজটিই করেন।

ফুকো বর্ণিত পঞ্চম পদ্ধতিটি হল, "Through the medicalization of the effects of confession"[১৭]। এখানে 'medicalization' বলতে তিনি বোঝান যে, যৌনতার বিষয়গুলিকে শুধুমাত্র সরলভাবে 'ভুল', 'পাপ' অথবা 'অস্বাভাবিক'—এভাবে না মূল্যায়ন করে এগুলিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাখ্যা করা শুরু হয়। এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও যৌনতার বিজ্ঞান নির্মাণে নানাভাবে এই 'medicalization'-এর সাহায্য নেন ঔপন্যাসিক। যেমন, এই লেখায় উপন্যাসের একটি অংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে 'ভিন্ন' যৌনতাকে বোঝাতে গিয়ে মানবশরীরের ক্রোমোজোমের 'ক্যারিওটিক টাইপ' থেকে শুরু করে 'ইউনিকয়েড গ্রোথ' পর্যন্ত এক বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে দিয়ে পাঠককে যেতে হয়।

লেখাটি শেষ করবো উপন্যাসের একদম শুরুর দিকের একটি অংশকে উদ্ধৃত করে, যেখানে 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠানটির সম্পর্কে বলা হচ্ছে—'অনিকেত গোটা ধারাবাহিকটা এইভাবে সাজিয়েছিল—

—জীব জগতের বিবর্তন।

—কোষ, ক্রোমোজোম, জিন ইত্যাদি।

—প্রজনন প্রক্রিয়ার বিবর্তন। মানে এককোষী জীবের প্রজনন থেকে বহুকোষী জীবের প্রজননের ধারাবাহিকতা।

—মানব দেহ ও প্রজনন অঙ্গ।

—ডিম্বানু, শুক্র, বীর্য, ঋতু ইত্যাদি।

—স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক যৌনতা।

—যৌনতা সম্পর্কিত কুসংস্কার।

—গর্ভপাতের কুফল।

—যৌন স্বাস্থ্যবিধি।'[১৮]

ঔপন্যাসিক, 'অনিকেত'এর মাধ্যমে শুধু রেডিও অনুষ্ঠান দিয়েই 'সচেতনতা' বিস্তার করেন না, এই উপন্যাসও হয়ে ওঠে যৌনবিজ্ঞান নির্মাণ ও সেই সূত্রে 'অপর' যৌন যাপনের স্বীকৃতির সহায়ক।

তথ্যপঞ্জি

১। Althusser, L. 1970; *Lenin and Philosophy and other essays;* NLB, London.

২। Freud, S. *Totem and Taboo,* 1919; (translated by A. A. Brill) George Routledge & Sons Limited, London, pp 30.

৩। ঐ, pp 32.

৪। চক্রবর্তী, স্বপ্নময়। ২০১৫। *হলদে গোলাপ;* দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১।

৫। ঐ।

৬। রায়, অভিজিত, *কামনার ভার;* রবিবারোয়ারি, এই সময়; কলকাতা, ২৯ জুন ২০১৪।

৭। চক্রবর্তী (২০১৫), পৃষ্ঠা ১২।

৮। Halliday, M.A.K. 1974; *Language and Social Man,* Longman, pp 32.

৯। চক্রবর্তী (২০১৫), পৃষ্ঠা ৩০৩।

১০। Hall, Kira, 1995; *Hijra / hijrin : Language and Gender Identity.* University of California, Berkeley.

১১। Halliday, M.A.K. 1976; *Anti Language.* American Anthropologist, new serious; vol 78, no 3, pp 570.

১২। ঐ, pp 575.

১৩। Awan, Muhammad Safeer & Sheeraz, Muhammad, 2011; *Queer but language : A Sociolinguistic Study of Farsi.* International journal of humanities and Social Science; Vol-1 no-10; pp 129.

১৪। চক্রবর্তী (২০১৫), পৃষ্ঠা ৮১।

১৫। Foucault, M. *The History of Sexuality* 1990; (translated by Robert Hurley) Vintage Books; New York, 1990, pp 66.

১৬। ঐ।

১৭। ঐ, pp 67.

১৮। চক্রবর্তী (২০১৫), পৃষ্ঠা ৩০।